প্রশ্ন ২। 'মন্দির' গল্পের শক্তিনাথের চরিত্র চিত্রণ করো।

উত্তর। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মন্দির' নামক গল্পটির মধ্যে প্রধান যে তিনটি চরিত্র হয়েছে, তাদের মধ্যে নায়িকা অপর্ণা এবং শক্তিনাথের চরিত্রের মধ্যে একটি সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই উভয় চরিত্রই তাদের নিজস্ব কাজের তুলনায় অন্য কাজের প্রতি সবিশেষ মনোযোগী। অপর্ণা যেমন তার নারী জীবনের স্বাভাবিকতার তুলনায় মদনমোহনের মন্দিরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে, ঠিক সেই রকম শক্তিনাথও তার পৌরোহিত্য কর্মের প্রতি আগ্রহী না হয়ে কুমোরদের সঙ্গে পুতুলে রং করার কাজে মেতেছিল।

শক্তিনাথ ভট্টাচার্যের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন যে, সে হচ্ছে জমিদার রাজনারায়ণবাবুর মদনমোহন মন্দিরের পুরোহিত মধুসূদন ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুত্র। শৈশবে মাকে হারানোর ফলে শক্তিনাথের মধ্যে সংসারের উচিত অনুচিতের সহবৎ শিক্ষায় সে শিক্ষিত হতে পারেনি। তাই পরনের কাপড়ে মুড়িমুড়কী নিয়ে কুমোরদের বাড়িতে এসে সে পুতুল তৈরি করা দেখত। যত্নের অভাবে সে অশক্ত, রোগক্লিষ্ট। সেই কারণেই হোক কিংবা পত্নীহীন সংসারের প্রতি বৈরাগ্যবশতই হোক, তার পিতা মধুসূদন পুত্রকে কেবল দুবেলা রেঁধে দুমুঠো খাদ্য মুখে দেওয়ানো ছাড়া আর কিছুই তিনি করতে পারেন নি। শক্তিনাথ অন্যমনস্কভাবে সারাদিন ফুল পেড়ে, পাতা ছিঁড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সময় কাটাতো। রোগক্লিষ্ট হওয়ার জন্যে সে বন্ধুবান্ধব, পড়াশোনা, খেলাধুলো বিবর্জিত হয়ে পড়েছিল। এই একাকীত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতেই সে নদীর তীরে কুমোরদের বাড়িতে প্রথম প্রথম বসে পুতুল তৈরি করা দেখত। পরে পুতুলে রং করত। তার নিজের কাজ, পৈত্রিক পেশা এ সমস্তই তার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল। তাই পিতার মৃত্যুর পর যখন তার ডাক পড়ল জমিদারের মন্দিরে পুজো করার জন্যে, তখন সে পুজো করা তার পক্ষে ছেলেখেলা তুল্য হয়েছিল। মন্দিরের মদনমোহন বিগ্রহের চেয়ে তার কাছে আকর্ষণীয় হয়েছিল অপর্ণার উপস্থিতি। অপর্ণার প্রশ্রয়েই সে মন্দিরের পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিল। গ্রামের অন্যান্য পুরোহিতরা এতে যথেষ্ট আপত্তি করলেও অপর্ণা শক্তিনাথকে মন্দির থেকে বিদায় দিতে পারেনি। বরঞ্চ, নিয়ম সর্বস্ব মন নিয়েও সে শক্তিনাথকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিল যে, সে যা জানে তা দিয়ে পুজো করলেই ঠাকুর সন্তুষ্ট হবেন।

বস্তুত, মন্দিরের পুজোর দৌলতে শক্তিনাথ একটা স্নেহের আশ্রয় পেয়েছিল। আর অপর্ণাও পিতৃমাতৃহীন শক্তিনাথের প্রতি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাই যখন শুনল যে শক্তিনাথ কোনো দিন রেঁধে খায় কোনো দিন খায় না—তখন তার নিত্য আহার্যের ব্যবস্থা সে করে দিয়েছিল। অপর্ণার কাছ থেকে সেই স্নেহের প্রশ্রয় পাওয়ার ফলে শক্তিনাথের মন পরিণত হতে পারেনি এবং দায়িত্ব বোধও জাগতে পারেনি। তাই সে মামার সঙ্গে কোলকাতা যাবে বলে মন্দিরে পুজো করতে আসেনি। আবার কোলকাতা থেকে কবে আসবে এই কথা জানতে চাইলে তার কাছে এই জবাব পায় যে, মামা যেদিন আসতে দেবেন, সেদিন সে আসবে। তার এই কথা থেকেই তার দায়িত্বহীনতা প্রমাণিত হয়। শৈশব থেকে মাতৃহীন সংসারে একাকীত্বের মধ্যে বেড়ে ওঠাই তার এই দায়িত্বহীন মানসিকতার অন্যতম কারণ।

কোলকাতায় তার বৌদিদি যখন তাকে অপর্ণার কথা জিজ্ঞাসা করে তখন তাঁর কাছে সে বলে যে অর্পণার জন্যে তার মন কেমন করছে তাই তার আর কোলকাতায় ভাল লাগছে না। তার এই কথার মধ্যে কণামাত্রও প্রেমের ইঙ্গিত ছিল না। যা ছিল তা হল অপর্ণার স্নেহের আশ্রয়ের জন্যে ব্যাকুল

মনের প্রকাশ। কিন্তু বৌদিদি সে তত্ত্ব বোঝেননি। তিনি তার হাতে অপর্ণাকে দেওয়ার জন্যে দু শিশি সেন্ট দিয়েছিলেন।

মন্দিরে এসে স্বাভাবিক মানসিকতায় অথবা অপর্ণার স্নেহ সাহচর্যে প্রাপ্ত সহবৎ শিক্ষার গুণে প্রথমে কয়েকদিন চাদরে করে সেন্টের শিশি দুটি বেঁধে আনলেও অপর্ণাকে তা সে দিতে পারেনি। পরে যেদিন অপর্ণার হাতে দিল, সেদিন অপর্ণা ভুল বোঝে, সে শিশি দুটি পুরোনো ফুলের স্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাকে মন্দির থেকে বের করে দেয়। এরপর সে আর মন্দিরমুখো হয়নি। তার কিছুদিন পরেই তার মৃত্যু হয়েছিল। শেষোক্ত ঘটনা দুটি থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, শক্তিনাথের মনে ছেলেমানুষী ভাবের অবসান ঘটেছিল। এবং সে স্বাভাবিক যুবকের মতো অভিমানী হয়ে ওঠার কারণেই অপর্ণাকে তার অসুস্থতার সংবাদ পর্যন্ত দেয়নি। বস্তুত, তার মন জেগে উঠেছিল। কিন্তু সেই জেগে ওঠার পরিণতির সংবাদ পাঠক পায়নি। শক্তিনাথের মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই তার জীবন কাহিনি শেষ হয়ে যায়। তবে পাঠক এই কথা জানতে পারে যে, শক্তিনাথের মৃত্যু অপর্ণাকে নারী হিসেবে জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। এই কারণেই আলোচ্য গল্পের শক্তিনাথের চরিত্রটির গুরুত্ব অপরিসীম।